ফিক্বহী মাসায়েল

أحكام فقهية – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

أحكام فقهية

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الرابعة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)

أحكام فقهية – باللغة البنغالية / الزلفي ١٤٢٤

٤٦ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٣-٣٨- ٨٦٤-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-العبادات (فقه إسلامي) ٢-الزواج (فقه إسلامي) أ. العنوان

ديوي ٢٥٢ ١٤٢٤/٥١٧٠

رقم الإيداع : ١٤٢٤/٥١٧٠

ردمك : ٣-٣٨- ٨٦٤-٩٩٦٠

أحكام الزكاة

যাকাতের বিধি-বিধান

যাকাতের হুকুমঃ

যাকাত হল ইসলামের রূকনসমূহের দ্বিতীয় রূকন। প্রত্যেক মুসলিমের উপর তা ওয়াজিব, যদি নেসাবের মালিক হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة:١١٠]

"আর তোমরা নামায কায়েম (যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত) করো ও যাকাত প্রদান করো।" (সূরা বাক্বারা ১১০) যাকাতের বিধান প্রণয়নের মধ্যে রেয়েছে বহু লাভ ও উপকারিতা। যেমন,

১। আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ এবং তার মধ্য হতে কৃপণতার অভ্যাসকে দূরীকরণ।

২। দানশীলতার অভ্যাসে মুসলিমদের অভ্যস্তকরণ।

৩। ধনী ও গরীবের মধ্যে প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্টাকরণ।

৪। অভাবী মুসলিমদের দেখাশুনাকরণ ও তাদের প্রয়োজন পূরণকরণ।

৫। মানুষকে পাপ থেকে পবিত্রকরণও যাকাতের উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যাকাত প্রদানে পাপ মোচন হয় এবং মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

কিসে যাকাত ওয়াজিব হয়?

যাকাত ওয়াজিব হয় সোনা, রূপা, ব্যবসা-সামগ্রী, চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার, এবং জমি থেকে উৎপাদিত ফসলাদি ও খনিজদ্রব্যে।

সোনা ও রূপার যাকাতঃ

সোনা ও রূপা যে ধনেরেই হোক না কেন, যখনই কেউ নেসাবের মালিক হবে, তখনই তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। সোনার নেসাব হল, কুড়ি মিসকাল তথা ৮৫ গ্রাম সমপরিমাণ। আর রূপার নেসাব হলো, ২০০ দিরহাম নববী, অর্থাৎ, ৫৯৫ গ্রাম। যে ব্যক্তি (উল্লিখিত) নেসাবের মালিক হবে, তাকে ২, ৫ % যাকাত হিসাবে দিতে হবে। কেউ যদি প্রচলিত মুদ্রায় সোনা ও রূপার যাকাত আদায় করতে চায়, তাহলে যে সময় যাকাত আদায় করতে যাচ্ছে, সে সময়ে সোনা ও রূপার গ্রাম কত চলছে, সে ব্যাপারে জেনে নেবে। অতঃপর তার দেশে প্রচলিত মুদ্রায় যাকাত আদায় করে দিবে। এর উদাহরণ হলো, মনে করুন, কেউ যদি ১০০ গ্রাম সোনার মালিক হয়, আর তার উপর যদি এক বছর অতিবাহিত হযে যায়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে, কারণ, সে নেসাবের মালিক হয়ে গেছে, আর তাতে যাকাত লাগবে আড়াই গ্রাম। এখন সে যদি প্রচলিত মুদ্রায় তা আদায় করতে চায়, তাহলে সোনার মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তারপর সোনার পরিমাণকে (সোনার) গ্রামের মূল্যের সাথে গুণ করবে। অতঃপর মূল্য অনুপাতে ২, ৫ % সোনার যা মূল্য দাঁড়াবে, তা প্রচলিত মুদ্রায় আদায় করবে। রূপার ক্ষেত্রেও অনুরূপ করবে।

নগদ টাকাতেও যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। সুতরাং কারো কাছে যদি

৮৫ গ্রাম স্বর্ণের সমপরিমাণ টাকা থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তাকে ২, ৫ % পরিমাণ অনুপাতে যাকাত দিতে হবে। মুসলিমের কেবল কর্তব্য হল, তার কাছে যদি এক বছর পর্যন্ত গচ্ছিত কোনো মাল থাকে, তাহলে সোনা বিক্রেতাকে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। অতঃপর তার মাল যদি সেই পরিমাণ হয়, তাহলে যাকাত আদায় করবে। আর যদি তার মাল বিক্রেতার বলা পরিমাণের থেকে কম হয়, তাহলে তার উপর যাকাত নেই। এর দৃষ্টান্ত হল, একটি মানুষের কাছে ৭০৪০ (সাত হাজার চল্লিশ) টাকা আছে এবং এই টাকার উপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাহলে সে এক গ্রাম রূপার মূল্য কত, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, যদি তার দেশের মুদ্রা রূপার উপর নির্ধারিত হয়। অতঃপর যদি দেখে ৫৯৫ গ্রাম রূপার দাম দাঁড়াচ্ছে ৮০০০ (আট হাজার) টাকা, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ, তার কাছে বিদ্যমান টাকা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছেনি। আর নেসাব হলো, ৫৯৫ গ্রাম রূপার সমপরিমাণ টাকা, আর তা হল, ৮০০০ (আট হাজার) টাকা। সোনার ব্যাপারটাও অনুরূপ।

ব্যবসা-সামগ্রীতে যাকাত

যে মুসলিম ব্যবসায়ী তার টাকা ব্যবসায় খাটায়, তার উচিত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তার অভাবী ভাইদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে

বাৎসরিক যাকাত আদায় করা। এমন প্রত্যেক জিনিস ব্যবসা-সামগ্রীর সধ্যে শামিল হবে, যা লাভের উদ্দশ্যে কেনা-বেচার জন্যই রাখা হয়। তাতে তা স্থাবর সম্পত্তি হোক, পশু, খাদ্য ও পানাহার দ্রব্য এবং গাড়ি ইত্যাদি যা-ই হোক না কেন। এ জিনিসগুলোর মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হল, তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। আর সোনা অথবা রূপার মূল্য অনুপাতে এ সবের নেসাব নির্ধারিত হবে। আর (নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে গেলে) সমস্ত মূল ধন থেকে ২,৫% যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে। তাই কোনো মানুষের কাছে যদি এক লক্ষ টাকা সমপরিমাণ ব্যবসা-সামগ্রী থাকে, তাহলে তাতে ২৫০০ টাকা যাকাত ওয়াদিব হবে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রত্যেক ব্যবসায়ীর উচিত প্রত্যেক বছরের শুরুতে তাদের নিকট মজূদ তহবিলের হিসাব ক'রে তার যাকাত আদায় করবে। কোনো ব্যবসায়ী যদি তার নিকট সঞ্চিত অর্থের এক বছর অতিবাহিত হওয়ার দশ দিন আগে অন্য কোনো সামান কিনে নেয়, তাহলে অন্যান্য সামানের সাথে এই (সদ্য কেনা) সামানেরও যাকার আদায় করতে হবে। আর প্রথম যেদিন থেকে ব্যবসা আরম্ভ করে, সেদিন থেকেই বছরের গণনা শুরু হয়ে যাবে। যাকাত বছরে একবারই লাগে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত প্রতি বছর তার নিকট সঞ্চিত বস্তুর যাকাত আদায় করে দেওয়া। যে পশুর চারার ব্যবস্থা করতে হয়, তা যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে (রাখা) হয়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। তাতে তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছাক, বা না

পৌঁছাক। প্রচলিত মুদ্রায় তার মূল্য নেসাব পর্যন্ত পৌঁছলেই, প্রচলিত মুদ্রায় তার যাকাত আদায় করবে।

যৌথকারবারের মূল ধনের অংশের যাকাতঃ

বর্তমানে মানুষ স্থাবর-সম্পত্তি ইত্যাদিতে শেয়ারে (অপরের সাথে অংশে শরীক হয়ে) যৌথভাবে কারবার করে। আবার কেউ কেউ এতে কয়েক বছর পর্যন্ত তার পুঁজি লাগিয়ে রাখে, যা বৃদ্ধি পেতেও পারে, আবার হ্রাসও পেতে পারে। (শরীক হিসাবে লাগিয়ে রাখা) এই অংশেও যাকাত লাগবে। কারণ, এটাও ব্যবসা-সামগ্রী বলে গণ্য হবে। তাই মুসলিমের উচিত প্রতি বছর তার অংশের মূল্য সম্পর্কে জানবে এবং তার যাকাত আদায় করবে।

জমি থেকে উৎপন্ন ফসলে যাকাতঃ

এমন শস্য যা ওজন ও সঞ্চিত করা যায়, তাতে যাকাত ওয়াজিব হয়। যেমন, খেজুর, পনির, গম, যব এবং ধান ইত্যাদি। তবে ফল-মূল ও শাক-সব্জীতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। আর তাতে (খেজুর, পনির, গম, যব এবং ধান ইত্যাদিতে) যাকাত তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছবে। নেসাব হলো, ৬১২ কিলো গ্রাম। আর এই প্রকার জিনিসে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্তও থাকে না। বরং যখনই শস্য ও ফল (খেজুর) ইত্যাদি পেকে যাবে এবং তা খাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে, তখনই তাতে যাকাত

ওয়াজিব হবে। আর তাতে দশভাগের একভাগ দিতে হবে, যদি তা কোনো প্রকার অর্থ ব্যয় ছাড়াই বৃষ্টি অথবা নদী ইত্যাদির পানির দ্বারা চাষাবাদ করা হয়। কিন্তু যদি ব্যয় ক'রে চাষাবাদ করা হয়, তাহলে বিশভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। এর উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি গম লাগালো এবং তাতে ৮০০ কিলো গম উৎপাদিত হলো, তাহলে তাতে দশভাগের একভাগ যাকাত ওয়াজিব হবে। আর তা হলো, ৮০ কিলো, যদি তা কোনো প্রকার অর্থ ব্যয় ছাড়াই চাষাবাদ করা হয়। তবে যদি অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহলে তাতে বিশভাগের একভাগ লাগবে, আর তা হলো, ৪০ কিলো।

চতুষ্পদ জানোয়ারের যাকাতঃ

চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার বলতে উট, গরু (মোষ), ছাগল ও ভেড়াকে বুঝানো হয়েছে। তবে এতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কিছু শর্ত আছে। আর তা হলো নিম্নরূপঃ

১। নেসাব পর্যন্ত পৌঁছানো। আর উটের সর্বনিম্ন নেসাব হল, পাঁচ। ছাগল ও ভেড়ার নেসাব হল, চল্লিশ। গরু (ও মোষের) নেসাব হল, ত্রিশ। (উল্লিখিত) নেসাবের কম হলে তাতে যাকাত লাগবে না।

২। মালিকের নিকট এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

৩। চারণভূমিতে চরে খাওয়া জানোয়ার হওয়া। চতুষ্পদ জানোয়ারের মধ্যে কেবল সেই জানোয়ারেরই যাকাত আদায় করতে হবে, যারা

বছরের অধিকাংশ দিনগুলোতে চরে খায়। কিন্তু যারা চরে খায় না, বরং মালিক কিনে খাওয়ায় অথবা খাবারের জোগাড় মালিককেই করতে হয়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে যদি বছরের অধিকাংশ দিনগুলোতে চরে খায়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

৪। কাজের জন্য যেন না হয়। কাজের জন্য বলতে যাকে মালিক চাষ অথবা বোঝাবহন ইত্যাদির কাজে ব্যবহার করে।

উটের যাকাতঃ

উটের যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর তার নেসাব হলো, পাঁচটি উট। সুতরাং কোনো মুসলিম যখন পাঁচ থেকে নয়টি উটের মালিক হয়ে যাবে এবং এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তাকে একটি ছাগল (যাকাত হিসাবে) দিতে হবে। আর ১০ থেকে ১৪টি উটের মালিক হলে দু'টি ছাগল লাগবে। ১৫ থেকে ১৯টি উটের মালিক হলে তিনটি ছাগল লাগবে। ২০ থেকে ২৪টি উটের মালিক হলে চারটি ছাগল লাগেব। ২৫ থেকে ৩৫টি উটের মালিক হলে, একটি 'বিনতে মাখায' লাগবে। 'বিনতে মাখায' হল, পূর্ণ এক বছর উটের একটি বকনা বাছুর। তবে যদি তা (বকনা বাছুর) না পায়, তাহলে 'ইবনে লাবুন' তথা পূর্ণ দুই বছরের একটি দামড়া বাছুর যথেষ্ট হবে। আর ৩৬ থেকে ৪৫টি উটের মালিক হলে একটি 'বিনতে লাবুন' লাগবে। 'বিনতে লাবুন' হলো, পূর্ণ দুই বছরের

একটি বকনা বাছুর। আর যদি ৪৬ থেকে ৬০টি উটের মালিক হয়, তাহলে একটি 'হিক্কা' লাগবে। 'হিক্কা' হলো, তিন বছরের উটের বাছুর। যদি ৬১ থেকে ৭৫টি উটের মালিক হয়, তাহলে একটি 'জাযাআ' লাগবে। 'জাযাআ' হল, চার বছরের উটের বাছুর। ৭৬ থেকে ৯০টি উটের মালিক হলে 'বিনতা লাবুন' লাগবে। 'বিনতা লাবুন' হলো, পূর্ণ দুই বছরের দু'টি বকনা বাছুর। আর যদি ৯১ থেকে ১২০টি উটের মালিক হয়, তাহলে 'হিক্কাতান' লাগেব। 'হিক্কাতান' হলো, তিন বছরের দু'টি বাকনা বাছুর। (উল্লিখিত) এই নেসাবের অতিরিক্ত হলে প্রত্যেক চল্লিশে একটি 'বিনতে লাবুন' এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি 'হিক্কা' দিতে হবে।

নিম্নে দেওয়া তালাকিটি যাকাতের ব্যাপারেটা আরো সুন্দরভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

৫ থেকে ৯ পর্যন্ত১টি ছাগল।

১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত ২টি ছাগল।

১৫ থেকে ১৯ পর্যন্ত ৩টি ছাগল।

২০ থেকে ২৪ পর্যন্ত ৪টি ছাগল।

২৫ থেকে ৩৫ পর্যন্ত পূর্ণ উটের বছরের একটি বকনা বাছুর।

৩৬ থেকে ৪৫ পর্যন্ত উটের দু'বছরের একটি বকনা বাছুর।

৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত উটের তিন বছরের বকনা বাছুর।

৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত উটের চার বছরের বকনা বাছুর।

৭৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত উটের এক বছরের দু'টি বাছুর।

৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত উটের চার বছরের দু'টি বাছুর।

উল্লিখিত নেসাবের অতিরিক্ত হলে প্রত্যেক চল্লিশে একটি দুই বছরের বাছুর এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে তিন বছরের বাছুর লাগবে।

গরুর যাকাতঃ

যদি কোনো মানুষ ৩০ থেকে ৩৯টি গরুর মালিক হয়, তাহলে তাকে পূর্ণ এক বছরের একটি বাছুর যাকাত হিসাবে দিতেহবে। আর যদি ৪০ থেকে ৫৯টি গরুর মালিক হয়, তাহলে তাকে দু'বছরের একটি বাছুর যাকাত হিসাবে দিতে হবে। যদি ৬০ থেকে ৬৯টি গরুর মালিক হয়, তাহলে পূর্ণ এক বছরের দু'টি বাছুর লাগবে। যদি ৭০ থেকে ৭৯টি গরুর মালিক হয়, তাহলে দু'টি বাছুর লাগবে, একটি দু'বছরের, আর একটি এক বছরের। অতঃপর প্রত্যেক ৩০টি গরুতে এক বছরের এবং প্রত্যেক ৪০টি গরুতে দু'বছরের বাছুর লাগবে। এইভাবে যত সংখ্যা বাড়বে, সেই হিসাবে যাকাতের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে। নিম্নের তালিকা য় দেখুন।

৩০ থেকে ৩৯ পর্যন্ত পূর্ণ এক বছরের বাছুর।

৪০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত পূর্ণ দু'বছরের বাছুর।

৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্তনপূর্ণ এক বছরের দু'টি বাছুর।

৭০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত ১টি ১বছরের ও ১টি দু'বছরের বাছুর।

ছাগলের যাকাতঃ

কোনো মানুষ যদি ৪০ থেকে ১২০টি ছাগলের মালিক হয়, তাহলে তার উপর একটি ছাগল (যাকাত হিসাবে দেওয়া) ওয়াজিব হবে। আর ১২১ থেকে ২০০টি ছাগলের মালিক হলে দু'টি ছাগল ওয়াজিব হবে। ২০১ থেকে ৩৯৯টি ছাগলের মালিক হলে তিনটি ছাগল যাকাত হিসাবে দিতে হবে। ৪০০ থেকে ৪৯৯টি ছাগলের মালিক হলে চারটি ছাগল লাগবে। ৪০১ থেকে ৫৯৯টি ছাগলের মালিক হলে পাঁচটি ছাগল লাগবে। অতঃপর প্রত্যেক ১০০টায় একটি করে ছাগল বাড়তে থাকবে। তালিকায় দেখুন,

৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত একটি ছাগল।

১২১ থেকে ২০০ পর্যন্ত দু'টি ছাগল।

২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত তিনটি ছাগল।

৩০১ থেকে ৪০০ পর্যন্ত ছারটি ছাগল।

৪০১ থেকে ৫০০ পর্যন্ত পাঁচটি ছাগল।

যাকাতের হকদারঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة:٦٠]

"(ফরয) স্বাদক্বা শুধুমাত্র নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত এবং স্বাদক্বা (আদায়ের) কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের মনকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (সংগ্রামকারী) ও (বিপদগ্রস্ত) মুসাফিরের জন্য। এ হলো আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত (ফরয বিধান)। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা ৬০)

(উক্ত) আয়াতে মহান আল্লাহ আট শ্রেণীর মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা যাকাতের হকদার। ইসলামে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হয় সামাজিক উন্নয়নে ও অভাবীদের মাঝে, দ্বীনের আলেমদের জন্য তা নির্দিষ্ট নয়। যেমন, অন্যান্য বহু ধর্মে লক্ষ্য করা যায়। আর যাকাত খাওয়ার হকদার হলো,

১। ফকীরঃ যার নিকট প্রয়োজনের অর্ধেক থাকে (তাকে ফকীর বলা হয়)।

২। মিসকীনঃ যার নিকট তার প্রয়োজনের অর্ধেকের বেশী থাকে, কিন্তু তাতে তার যথেষ্ট হয় না। সুতরাং যাতে তার যথেষ্ট হয়, ততটা পরিমাণ যাকাত থেকে দেওয়া হবে, কয়েক মাস অথবা এক বছরের জন্য।

৩। যারা যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্তঃ তারা হলো এমন ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে শাসক কর্তৃক যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়। আর তাদের নির্ধারিত কোনো বেতন থাকে না। তাদেরকে তাদের কাজ অনুযায়ী উপযুক্ত অর্থ দিতে হবে. যদিও তারা ধনী হয়।

৪। যাদের মনকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করা আবশ্যকঃ এরা হলো এমন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, যাতের বংশের লোকেরা তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ করার আশা থাকে অথবা (কম-সে-কম) তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে মুসলিমগণ রক্ষা পায়। অনুরূপ যারা নবাগত মুসলিম, তাদের মন জয় করার উদ্দশ্যে এবং ঈমানকে তাদের আরো সুদৃঢ় করতে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে।

৫। অনুরূপ ক্রীতদাসকে (দাসত্ব জীবন থেকে) মুক্ত করতে এবং শত্রুদের হাতে বন্দীদেরকে ছাড়াতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৬। ঋণগ্রস্তঃ যাদের উপর ঋণ থাকে, তাদেরকে তাদের ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে। তবে শর্ত হলো, তাকে মুসলিম হতে হবে এবং সে যেন এমন ধনী ব্যক্তি না হয়, যার ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকে। অনুরূপ তার ঋণ যেন কোনো অন্যায় কাজের জন্য নেওয়া না হয় এবং সে ঋণ যেন অতি সত্বর আদায় করার ব্যাপার থাকে।

৭। আল্লাহর পথেঃ এমন মুজাহিদগণ, কোনো আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তাদের নির্ধারিত কোনো বেতন থাকে না। তাদের জন্য অথবা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র কেনার জন্য যাকাত থেকে দেওয়া যাবে। অনুরূপ যারা দ্বীনি জ্ঞানার্জন করে, তারাও জিহাদের আওতায় পড়বে। সুতরাং কেউ যদি শরীয়তের জ্ঞানার্জন করতে চায়, কিন্তু তার অর্থের অভাব, তাকে শরীয়তের জ্ঞানার্জন করার জন্য যতটা অর্থের দরকার, সে অর্থ

যাকাত থেকে দেওয়া যাবে।

৮। মুসাফিরঃ যে মুসাফির পথিমধ্যে নিঃস্ব হয়ে যায় এবং তার কাছে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাবার মত কিছুই থাকে না, তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে যতটা লাগে, ততটা অর্থ যাকাত থেকে দেওয়া যাবে, যদিও সে তার শহরে ধনী হয়।

যাকাতের অর্থ কোনো মসজিদ নির্মাণে এবং রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি মেরামতের কাজে ব্যয় করা যাবে না।

বিঃদ্রঃ

১। সমুদ্র থেকে পাওয়া জিনিসের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমন, মণি-মুক্তা, প্রবাল এবং মাছ ইত্যাদি। তবে তা যদি ব্যবসার জন্য হয়, তাহলে তাতে যাকাত লাগবে।

২। অনুরূপ ভাড়াটে ঘরে এবং ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে যাকাত লাগবে না। তবে তা থেকে উপার্জিত অর্থে যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। যেমন মনে করুন, এক ব্যক্তি বাড়ি ভাড়া দিল এবং সে বাড়ির ভাড়াও পেল। আর এই (ভাড়া বাবদ পাওয়া) অর্থের উপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল অথবা অর্থের কিছু অংশের উপর যা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে গেছিল, এমতাবস্থায় তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

أحكام الأطعمة:

খাদ্য সম্পর্কীয় বিধি-বিধানঃ

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অপবিত্র খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন،

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة:١٧٢]

"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার করো।" (সূরা বাক্বারা ১৭২)

বস্তুতঃ হারাম বলে ঘোষিত বস্তু ব্যতীত সব খাদ্যই হালাল। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করে দিয়েছেন। যাতে তারা তার (পবিত্র বস্তুসমূহ) দ্বারা উপকৃত হতে পারে। তাই আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত দ্বারা কোনো অন্যায় কাজে সাহায্য গ্রহণ করা বৈধ নয়। আর পানাহারের মধ্যে যা হারাম, তা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام:١١٩]

"যা তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন।" (সূরা আনআম ১১৯) সুতরাং যা হারাম বলে বিবৃত হয়নি, তা হালাল। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ؛ فَلاَ تُضَيِّعُوْهاَ، وَحَدَّدَ حُدُوْداً؛ فَلاَ تَعْتَدُوْهاَ، وَحَرَّمَ أَشْياَءَ؛ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهاَ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْياَءَ رَحْمَةً لَّكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْياَنٍ؛ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهاَ) [رواه الطبراني]

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের উপর কিছু জিনিস ফরয করেছেন, তা নষ্ট করো না। কিছু সীমা বেঁধে দিয়েছেন, তা লঙ্ঘন করো না। কিছু জিনিস তিনি হারাম (অবশ্য পরিত্যাজ্য) করেছেন, সেগুলির মধ্যে লিপ্ত হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করেই কিছু জিনিস সম্পর্কে নীরব থেকেছেন, তার খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না।" (ত্বাবরানী)

বলাই-বাহুল্য এমন সব খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও পোশাকাদি, যার হারাম হওয়ার কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলেননি, তা হারাম বলা জায়েয নয়। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, প্রত্যেক পবিত্র ও ক্ষতিবিহীন খাদ্য হালাল। পক্ষান্তরে অপবিত্র ও ক্ষতিকর খাদ্য, যেমন, মৃত, রক্ত, মাদক দ্রব্য, ধূম-পান এবং এমন জিনিস, যার সাথে অপবিত্র জিনিস মিশে গেছে, এ সবই হারাম। কেননা, তা নোংরা ও ক্ষতিকর। আর মৃত বলতে শরীয়তী পদ্ধতিতে জবাই করা ছাড়াই যে প্রাণী মারা যায়। আর রক্ত বলতে জবাইকৃত পশু থেকে নির্গত প্রবহমান রক্ত। তবে জবাই করার পর মাংসে এবং রগসমূহে অবশিষ্ট থাকা রক্ত বৈধ।

যেসব খাদ্য হালাল তা দু'প্রকারের, (১) পশুজাত (২) উদ্ভিদসমূহ।

এ সবের মধ্যে যাতে কোনো ক্ষতি নেই, তা সবই হালাল।

পশুজাত দু'প্রকারের। এক প্রকার জীব-জানোয়ার যারা স্থলে বসবাস করে। আর এক প্রকার যারা সমুদ্রে বসবাস করে। যেসব পশু সমুদ্রে বসবাস করে, তা সবই হালাল, তাতে জবাই করার শর্ত আরোপিত হবে না। কারণ, সমুদ্রের মৃত হালাল। আর স্থলে বসবাসকারী মধ্যে যে কয়েক প্রকারের পশুকে ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে, সেগুলি ব্যতীত সবই হালাল। যেমন,

১। পাল্তু গাধা এবং শূকর।

২। গুঁইসাপ ব্যতীত দাঁত বিশিষ্ট এমন সব জানোয়ার, যারা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খায়।

৩। সব রকমের পাখিই হালাল, তবে কিছু পাখিকে (হালাল হওয়ার তালীকা থেকে) বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন,

(ক) যে পাখি থাবা দিয়ে আক্রমণ ক'রে শিকার করে। ইবনে আব্বাস-ﷺ-বলেন,

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطُّيُوْرِ)) [رواه مسلم ١٩٣٤]

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-প্রত্যেক দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র পশু এবং থাবা দিয়ে ধরে খায় এমন পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম ১৯৩৪)

(খ) যেসব পাখি পচা-গলা ও নোংরা জিনিস আহার করে। যেমন,

চিল, শকুনি (বাজপাখি) এবং কাক। নোংরা আবর্জনা আহার করার কারণে এগুলি হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে। ঘৃণিত জীব-জন্তুও হারাম। যেমন, সাপ, ইঁদুর এবং যমীনে বিচরণশীল কীট-পতঙ্গ।

উল্লিখিত পশু-পাখি ব্যতীত সবই হালাল। যেমন, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, মুরগী, জংলী গাধা, হরিণ, উট পাখি এবং খরগোশ ইত্যাদি। তবে 'জাল্লালাহ'কে এ থেকে পৃথক করা হয়েছে। আর 'জাল্লালাহ' ঐ পশুকে বলা হয়, যে বেশীরভাগ নোংরাজাতীয় জিনিস খায় এই ধরনের পশু খাওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম, যতক্ষণ না। তাকে তিন দিন পর্যন্ত আবদ্ধ রেখে পবিত্র খাদ্য দেওয়া হবে। অনুরীপ মসজিদে যাওয়ার সময় পিয়াজ, রশুন সহ এমন জিনিস খাওয়া অপছন্দনীয়, যা অতি দুর্গন্ধময়। কেউ হারাম খেতে বাধ্য হলে, অর্থাৎ, হারাম না খেলে তার প্রাণ চলে যাবে, তাহলে ততটা পরিমাণ আহার করা তার জন্য বৈধ হবে, যতটা খেলে সে বাঁচতে পারবে। তবে বিষ (কোনো অবস্থাতেই) খেতে পারবে না। কেউ যদি ঘেরাবিহীন বাগানের কোনো গাছের ফল গাছে অথবা পড়ে থাকা অবস্থায় পায়, যে বাগানের কোনো পাহারাদার নেই, সে ফল আহার করা তার জন্য বৈধ। তবে বয়ে নিয়ে যাওয়া, গাছে চড়া, কোনো কিছু দিয়ে তা পাড়া এবং গচ্ছিত ফল থেকে খাওয়া তার জন্য বৈধ নয়। তবে অত্যধিক প্রয়োজন হলে (তার কথা ভিন্ন)।

জবাই করার বিধানঃ

স্থলচর প্রাণী (খাওয়া) বৈধ হওয়ার শর্ত হলো, শরীয়তের পদ্ধতিতে তা জবাই করা। আর জবাই হলো, স্থলচর বৈধ পশুর কণ্ঠনালী ও খাদ্য নালীকে কেটে ফেলা। আর নিরুপায় অবস্থায় যে কোনো স্থানের রগ কেটে রক্ত বের করে দিতে হবে। যে জীব-জানোয়ার জবাই সম্ভব, তা বিনা জবাইয়ে হালাল হবে না। কারণ, বিনা জবাইয়ের পশু মৃত বলে গণ্য হয়।

জবাইয়ে শর্তাবলীঃ

১। জবাই করার উপযুক্ত হওয়াঃ অর্থাৎ, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম অথবা আহলে কিতাব হতে হবে। তাই কোনো পাগল অথবা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা ভালো-মন্দের পার্থক্য জ্ঞান আসেনি এমন শিশু জবাই করলে তা বৈধ হবে না। কেননা, অজ্ঞতার কারণে তার দ্বারা জবায়ের নিয়ত সহীহ-শুদ্ধ হয় না। অনুরূপ কোনো কাফের অথবা অগ্নিপূজক কিংবা কোনো কবরপূজক জবাই করলে, তাও বৈধ হবে না।

২। অস্ত্রের দ্বারা জবাই করাঃ সুতরাং এমন ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করা যায, যে ধারে রক্ত প্রবাহিত হয়। তাতে তা লোহা হোক অথবা পাথর কিংবা অন্য কিছু। তবে তা যেন হাড় ও নখ না হয়। কারণ, এ দু'টি জিনিস দিয়ে জবাই করা জায়েয নয়।

৩। কণ্ঠনালী কর্তন করাঃ অর্থাৎ, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং ঘাড়ের

উভয় রগের কোনো এক রগ কর্তন করা। জবায়ের জন্য এই স্থানকে নির্দিষ্ট করার এবং বিশেষভাবে এই জিনিসগুলো কাটতে বলার মধ্যে কৌশলগত দিক হল, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। কেননা, এই স্থানটি অনেকগুলো রগের কেন্দ্রস্থল। তাছাড়া এতে তাড়াতাড়ি প্রাণ নাশ হয়, ফলে গোশ্ ত সুস্বাদু হয় এবং পশুর কষ্টও কম হয়। উল্লিখিত স্থানে যদি জবাই করা সম্ভব না হয়, যেমন, শিকার ইত্যাদি, তাহলে পশুর শরীরের যে কোনো স্থানে ক্ষত করলেই তা জবাই বলে গণ্য হবে। যেসব পশু কোনো দুর্ঘটনায় আহত হয়, যেমন, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া, ধারবিহীন কিছু (ভারী জিনিস) দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যাওয়া, উঁচু স্থান থেকে পড়ে মারা যাওয়া, শৃঙ্গাঘাতে মারা যাওয়া এবং হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া পশু। (উল্লিখিত) এই পশুগুলো খাওয়া হালাল, তবে শর্ত হল, তার মধ্যে প্রাণ অবশিষ্ট থাকতে হবে এবং তাকে জবাই করতে হবে।

৪। জবাই করার সময় জবাইকারীকে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। 'বিসমিল্লাহ'র সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলাও সুন্নতসম্মত।

জবাই করার আদবসমূহঃ

১। ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে জবাই করা মাকরুহ (অপছন্দনীয়)।

২। পশুকে দেখিয়ে অস্ত্রে ধার দেওয়া ঠিক নয়।

৩। উত্তম হলো ক্বেবলামুখী ক'রে পশুকে জবাই করা।

৪। (জবাই করার পর) পশুর ঘাড় মোচড়ানো এবং (দেহ থেকে) প্রাণ বের হওয়ার আগেই তার চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি ঠিক নয়।

গরু ও ছাগলকে বাম দিকে কাত করে ফেলে জবাই করা সুন্নত। আর উটের ব্যাপারে সুন্নত হল, তাকে দাঁড় করিয়ে ডান হাত বেঁধে জবাই করা। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

শিকারঃ

শিকার করা জায়েয, যদি তা প্রয়োজনে হয়। কিন্তু তা (শিকার করা) যদি খেলাধূলার জন্য হয়, তবে তা হবে মাকরুহ (অপছন্দনীয়) কাজ। শিকার কৃত পশু-পাখির দু'টি অবস্থা হতে পারেঃ

১। হয় তাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে, এমতাবস্থায় তাকে জবাই অত্যাবশ্যক।

২। অথবা তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে, কিংবি জীবিত অবস্থায়, কিন্তু সে জীবন অতি সময়িক হবে, এমতাবস্থায় সে পশু হালাল। যে শর্তাবলী জবাইকারীর উপর আরোপিত হয়, তা শিকারীর উপরেও আরোপিত হবে। যেমন,

১। জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম অথবা আহলে কিতাব হওয়া। সুতরাং কোনো পাগল অথবা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি, কিংবা অগ্নিপূজক বা মূর্তিপূজক প্রভৃতি কাফেরের জবাই করা পশু মুসলিমের জন্য বৈধ হবে না।

২। অস্ত্র যেন এমন ধারালো হয়, যাতে রক্ত প্রবাহিত হবে। আর তা

যেন নখ ও হাড়জাতীয় কোনো কিছু না হয়। শিকার যেন ধারে আহত হয়, ভারীতে নয়। তবে শিকারী কুকুর ও পাখি, যাদের দিয়ে শিকার করা হয়, তারা যদি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তাদের দ্বারা শিকার কৃত পশু হালাল। আর শিক্ষাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে তখনই, যখন শিকারের জন্য যেতে বললে যাবে, আর না বলা পর্যন্ত যাবে না। আর শিকারকে সেটাকে সে মালিকের জন্য ধরে রাখবে, নিজের জন্য নয়।

৩। অস্ত্র যেন শিকার করার নিয়তেই চালানো হয়। তাই অস্ত্র হাত থেকে পড়ে কোনো শিকার মারা গেলে, তা হালাল হবে না, নিয়ত না থাকার কারণে। অনুরূপ শিকারী কুকুর যদি নিজেই গিয়ে কোনো শিকার মেরে ফেলে, তাহলে সেটাও হালাল হবে না। কারণ, তাকে তার মালিক শিকার করার নিয়তে পাঠায়নি। যদি কেউ শিকারকে লক্ষ্য কোনো কিছু চালায়, আর তা গিয়ে অন্য কাউকে আঘাত করে অথবা একদল শিকার তাতে মারা যায়, তাহলে সমস্ত শিকারই হালাল।

৪। তীর চালানো এবং শিকারী কুকুর প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা। 'বিসমিল্লাহ'র সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নত।

সাবধানঃ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যে তিনটি উদ্দেশ্যে কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন, সে তিনটি উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে কুকুর পোষা হারাম। আর (অনুমতি দেওয়া) সে তিনটি উদ্দেশ্য হলো, শিকার করার উদ্দেশ্যে, গবাদিপশু অথবা চাষ ক্ষেতের পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

أحكام اللباس

পোশাক-পরিচ্ছদের বিধিসমূহ

ইসলাম হলো সৌন্দর্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দ্বীন। মুসলিমের জন্য বৈধ করা হয়েছে, সে পাক-পবিত্র ও সুন্দর পোশাক পরিধান ক'রে নিজেকে বিকশিত করবে। এতে উদ্বুদ্ধও করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف:٢٦]

"হে বানী আদম (হে মানবজাতি)! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি। আর সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। এ হলো আল্লাহর নিদর্শন-সমূহের অন্যতম; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা আ'রাফ ২৬) পোশাকের ব্যাপারে (ইসলামের) মূল নীতি হলো, সব পোশাকই হালাল, কেবল সেই পোশাকগুলো ছাড়া, যার হারাম হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। ইসলাম এমন কোনো এক প্রকারের পোশাককে নির্দিষ্ট করে দেয়নি যে, কেবল সেটাই পরা উচিত। তবে পোশাকের ব্যাপারে কিছু নীতিমালা দিয়েছে। মুসলিমের পোশাক সেই নীতির আওতাভুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। নীতিগুলো নিম্নরূপঃ

১। পোশাকটি যেন লজ্জাস্থান আবৃতকারী হয়, প্রকাশকারী না হয়।

২। এমন পোশাক যেন না হয়, যা কাফেরদের অথবা অন্যায় কাজ সম্পাদনকারী বলে পরিচিত ব্যক্তিদের সাদৃশ্য গ্রহণ ক'রে পরা হয়।
৩। তাতে যেন অপচয় না হয় এবং অহঙ্কার প্রদর্শনও না করা হয়।
পোশাকের ব্যাপারে এই নীতিমালার খেয়াল রেখে মানুষ তার দরকার সমাজে প্রচলিত যে কোনো পোশাক পরতে পারবে।
পোশাকের ব্যাপারে যা নিষেধ তা হলো নিম্নরূপঃ
১। পরুষদের জন্য রেশমের কাপড় ও সোনা পরা। তবে মহিলাদের জন্য তা জায়েয। আর এ কথা আলী ইবনে আবূ ত্বালিব-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে,

((أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِى شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى)) [رواه النسائي وأبوداود وابن ماجة]

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-রেশম নিয়ে ডান হাতে রাখলেন এবং সোনা নিয়ে বাম হাতে রাখলেন" তারপর বলেলন, "এই জিনিস দু'টি আমার উম্মতের পুরুষদের উপর হারাম।" (নাসায়ী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজা) তবে পুরুষের রূপার আংটি পরাতে অথবা এমন জিনিস পরাতে কোনো দোষ নেই, যাতে সামান্য কিছু রূপা আছে।
২। এমন পোশাক যাতে কোনো প্রাণীর ছবি থাকে। সুতরাং মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে এমন পোশাক পরিধান করবে, যাতে কোনো মানুষের অথবা পশু-পাখির ছবি থাকে। তাতে তা কাপড়ে থাকুক

অথবা সোনার তৈরী কোনো জিনিসে থাকুক বা পরিধেয় কোনো জিনিসে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি বালিশ কিনে ছিলেন যাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লহ-ﷺ-তা দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, প্রবেশ করলেন না। আয়েশা (রাযায়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তাঁর চেহারায় অপছন্দের ভাব বুঝতে পারলাম। তাই বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, আমি কি অন্যায় করেছি? তিনি তখন বললেন,

((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ)) [متفق عليه]

“অবশ্যই এই চিত্রকরদেরকে কিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা চিত্রিত করেছ, তাতে প্রাণ দাও।” অতঃপর তিনি বললেন, “নিশ্চয় সে বাড়িতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না, যে বাড়িতে ছবি থাকে।” (বুখারী ২১০৫, মুসলিম ২১০৭)

৩। পুরুষদের গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম। আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ)) [رواه البخاري ٥٧٨٧]

“গাঁটের নীচে যার কাপড় ঝুলে, তার সে অংশটুকু জাহান্নামে যাবে।” (বুখারী ৫৭৮৭) জামা, পায়জামা, প্যান্ট এবং লুঙ্গি-চাদর সবই (গাঁটের নীচে) ঝুলানো নিষেধ। আর এটা অহঙ্কার ক’রে ঝুলানোর সাথে

নির্দিষ্ট নয়। তবে যে গর্ব ও অহঙ্কার ক'রে ঝুলায়, তার শাস্তি আরো কঠিন হবে। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [متفق عليه ٣٦٦٥ - ٢٠٨٥]

"যে গর্ব ও অহঙ্কার ক'রে (গাঁটের নীচে) তার কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে (রহমতের) দৃষ্টিতে তাকাবেন না।" (বুখারী ৩৬৬৫, মুসলিম)

৪। পুরুষ ও মহিলাদের এমন পাতলা-ঝলঝলে কাপড় পরা জায়েয নয়, যা লজ্জাস্থান আবৃত করে না এবং এমন সংকীর্ণ যেন না হয়, যাতে লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে।

৫। পোশাকে পুরুষদের মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা এবং মহিলাদের পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)) [رواه البخاري ٥٨٨٥]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-লানত করেছেন সেই পুরুষদেরকে, যারা মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং সেই মহিলাদেরেকে, যারা পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।" (বুখারী ৫৮৮৫)

৬। পোশাকে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করাও হারাম। মুসলিমের এমন পোশাক পরা জায়েয নয়, যা কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমার পরে থাকা দু'টি গেরুয়া রঙের কাপড় দেখে বললেন,

((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا)) [مسلم ٢٠٧٧]

"অবশ্যই এটা কাফেরদের পোশাক, তুমি তা পরিধান করো না।" (মুসলিম ২০৭৭)

পোশাক-পরিচ্ছদের (শরীয়তসম্মত) সুন্নাত ও আদবসমূহঃ

১। নতুন পোশাক পরার সময় যে সুন্নাতটি মুসলিমকে পালন করতে হয়, তা হলো দুআ পড়া। আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন কোনো নতুন কাপড় পরতেন, তখন সেটা জামা অথবা পাগড়ি যা-ই হত, সেই নামে নামকরণ ক'রে বলতেন,

((اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ ، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ)) [رواه أبو داود: ٤٠٢٠]

"আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু, আন্তা কাসাউতানী-হ, আসআলুকা মিন খায়রিহি অ খায়রি মা সুনিয়া লাহু, অ আঊযু বিকা মিন শার্রিহি অ শার্রি মা সুনিয়া লাহ" (হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা।

তুমিই আমাকে এ কাপড় পরিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটা যে জন্য তৈরী করা হয়েছে, সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি যার জন্য তৈরী করা হয়েছে, তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি)। (আবূ দাউদ ৪০২০)

২। ডান দিক থেকে পরতে আরম্ভ করাও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি-ﷺ-বলেছেন,

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ)) متفق عليه: ٤٢٦-٢٦٨

"রাসূলুল্লহ-ﷺ-পবিত্রতা অর্জন করা, মাথা আঁচড়ানো এবং জুতা পরা সহ প্রত্যেক কাজে যতদূর সম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করাকেই পছন্দ করতেন।" (বুখারী ৪২৬-মুসলিম ২৬৮) আর যখন জুতা পরতেন, তখনও ডান দিক হতে শুরু করতেন এবং যখন খুলতেন, তখন বাম দিক থেকে খুলতেন। কেননা, আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا)) [رواه البخاري ٥٨٥٦، مسلم ٢٠٩٧]

“তোমাদের কেউ যখন জুতো পরে, তখন সে যেন ডান পা দিয়ে শুরু করে এবং যখন জুতো খুলে, তখন যেন বাঁ পা থেকে আরম্ভ করে। আর জুতো পরলে দু’টোই পরবে, খুলে রাখলে দু’টোই খুলে রাখবে।” (বুখারী ৫৮৫৬, মুসলিম ২০৯৭)

৩। মুসলিম তার কাপড় ও শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাবে। এটা সুন্নাতের আওতাভুক্ত বিষয়। কাজেই সে কাপড় ও শরীরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার যত্ন নিবে। কেননা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হলো, প্রত্যেক সৌন্দর্যের এবং চমৎকার দৃশ্যের মূল। ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর উদ্বুদ্ধ করেছে এবং শরীর ও কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার বিশেষ যত্ন নিতে বলেছে।

৪। সাদা কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ))

[رواه أبوداود وغيره ٩١٥]

“তোমারা তোমাদের সাদা রঙের কাপড় পরিধান করো। কেননা, তা তোমাদের সর্বোত্ত কাপড়। আর ওতেই তোমাদের মৃতদেরকে কাফনাও।” (আবূ দাউদ ৯১৫) তবে অন্য সবই রঙই বৈধ।

৫। রকমারি পোশাক ও বৈধ সৌন্দর্য গ্রহণের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان ٦٧]

"এবং যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।" (সূরা ফুরক্বান ৬৭) আর বুখারী শরীফের হাদীসে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বেলেছেন,

((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ)) [رواه البخاري]

"খাও, পান করো, পরিধান করো এবং সাদক্বা করো কোনো অপচয় ও অহংকার ছাড়া।" (বুখারী)

أحكام النكاح

বিবাহের বিধানঃ

বিবাহের শর্তাবলীঃ

১। স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিঃ অতএব, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো পুরুষকে এমন নারীর সাথে বিবাহ করতে বাধ্য করা যাবে না, যাকে সে চায় না। অনুরূপ প্রাপ্তবয়স্কা, বুদ্ধিসম্পন্না কোনো নারীকে এমন পুরুষের সাথে বিবাহ করতে বাধ্য করা যাবে না, যাকে সে চায় না। নারীর সম্মতি ব্যতীত তার বিবাহ দেওয়াকে ইসলাম নিষেধ করেছে। যখন নারী কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ করতে অসম্মতি প্রকাশ করবে, তখন এ ব্যাপারে কেউ তাকে বাধ্য করতে পারবে না, যদিও সে তার পিতা হয়।

২। অলীঃ অলী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন, "অলী ব্যতীত বিবাহ নেই।" (তিরমিজী ১০২০) সুতরাং যদি কোনো নারী অলী ব্যতীতই বিবাহ করে, তাহলে তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। চাই সে নিজে নিজেই বিয়ে করুক, কিংবা অন্য কাউকে অভিভাবক নিযুক্ত ক'রে বিয়ে করুক। আর কোনো কাফির কোনো মুসলিম নারীর অভিভাবক হতে পারে না। যার কোনো অলী (অভিভাবক) নেই, তার ওয়ালী হবে দেশের শাসক (রাজা-বাদশাহ)।

আর অলী হলো, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিসম্পন্ন নারীর 'আসবা' জাতীয় আত্মীয়-স্বজন। যেমন, পিতা ও পিতা যাকে অসীয়ত করবে। অতঃপর

দাদা। এইভাবে পর্যায়ক্রমে ঊর্ধ্বে যাবে। যে যত নিকটের হবে, তার তত অগ্রাধিকার থাকবে। অতঃপর পুত্র ও পুত্রের পুত্র এইভাবে পর্যায়-ক্রমে নিম্নে যাবে। অতঃপর আপন ভাই। তারপর বৈমাত্রেয় ভাই। অতঃপর আপন ভাইয়ের ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্ররা। যে যত কাছের হবে, তার তত অগ্রাধিকার থাকবে। অতঃপর আপন চাচা। তারপর বৈমাত্রেয় চাচা। অতঃপর চাচাদের পুত্ররা। অতঃপর বাপের চাচা ও তার ছেলেরা। তারপর দাদার চাচা ও তার ছেলেরা। প্রত্যেক ওয়ালীর কর্তব্য হলো, বিবাহের পূর্বে মেয়ের নিকট অনুমতি নেওয়া। আর অলীর শর্ত আরোপ করার মধ্যে কৌশলগত দিক হল, ব্যভিচারের উপকরণাদি বন্ধ করা। কারণ ব্যভিচারী এ ব্যাপারে অক্ষম নয় যে, সে মহিলাকে বলবে, তুমি তোমাকে এতটা মহরের বিনিময়ে আমার সাথে বিবাহ করিয়ে দাও। অতঃপর আপন দু'জন সঙ্গী-সাথী, অথবা অন্য দু'জন কাউকে এই বিয়ের সাক্ষীরূপে রেখে নিবে।

৩। দু'জন সাক্ষীঃ বিবাহে দু'জন বা দু'জনের অধিক দ্বীনদার মুসলিমের উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক। অনুরূপ এই দু'জনকে বিশ্বস্ত এবং চুরি, ব্যভিচার, শারাবপান ইত্যাদি কাবিরাহ গুনাহ থেকে মুক্ত ব্যক্তি হতে হবে। বিবাহ-বন্ধনের শব্দ হল, স্বামী অথবা তার অভিভাবক বলবে, 'তোমার মেয়েকে অথবা যার ব্যাপারে তোমাকে অসীয়ত করা হয়েছে, তাকে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও' অতঃপর ওয়ালী বলবে, 'আমার মেয়েকে অথবা অমুককে আমার তত্ত্বাবধানে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে

দিলাম'। অতঃপর স্বামী বলবে, 'আমার সাথে তার বিবাহকে গ্রহণ করলাম' স্বামী তার তরফ থেকে কাউকে উকীল নিযুক্ত করতে চাইলে, তাও করতে পারে।

৪। মোহর প্রদানঃ আর মোহর কম হওয়াই শরীয়তের বিধান। তাই মোহর যত কম হবে ও সহজ-সাধ্য হবে, ততই উত্তম। মোহরকে সেদাক্বও বলা হয়। বিবাহের সময় মোহরের উল্লেখ করা এবং তখনই তা আদায় করে দেওয়া সুন্নাত। অনুরূপ সম্পূর্ণ মোহর পরে আদায় করা বা কিছু অংশ পরে আদায় করা ইত্যাদিতেও কোনো দোষ নাই। স্বামী যদি স্ত্রীকে তার সাথে যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে স্ত্রী অর্ধেক মোহরের অধিকারিণী হবে। আর যদি বিবাহের পর যৌন-মিলনের পূর্বে স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সম্পূর্ণ মোহর ও মিরাস উভয়েরই সে মালিক হবে।

বিবাহের পর যা আরোপিত হয়ঃ

১। ব্যয়ভারঃ ন্যায়সঙ্গত পন্থায় স্ত্রীর খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। যদি সে এ ওয়াজিব আদায় না করে, তাহলে সে গুনাহগার বিবেচিত হবে, আর স্ত্রীর জন্য জায়েয হবে যে, সে তার (স্বামীর) মাল থেকে প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ নিয়ে নিবে। অথবা কারো নিকট থেকে ঋণ নিবে, যা পরিশোধ করতে স্বামী বাধ্য থাকবে। ব্যয়ভারের অন্তর্ভুক্ত আরো একটি বিষয় হলো, ওলীমাহ করা। আর

ওলীমাহ হলো, বিবাহের দিনে স্বামী কর্তৃক আয়োজিত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, যাতে লোকদের আমন্ত্রণ করা হয়। এটা একটি এমন সুন্নাত, যার নির্দেশ দিয়েছেন নবী করীম-ﷺ-। তিনি নিজেও ওলীমা করেছেন এবং করতে নির্দেশও দিয়েছেন।

২। উত্তরাধিকারঃ যখনই কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে (শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত) সঠিক পন্থায় বিবাহ করবে, তখনই তাদের উভয়ের মধ্যে ওয়ারেসীস্বত্ব স্থাপিত হয়ে যাবে। এর প্রমাণ মহান আল্লাহ বাণী, তিনি বলেন,

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢]

"তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। এ তারা যা অসিয়ৎ করে তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তাদের জন্য, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ। এ তোমরা যা অসিয়ত করো তা কার্যকর ও

ঋণ পরিশোধ করার পর।" (সূরা নিসা ১২) আর এতে কোনো পার্থক্য নেই যে, স্বামী তার (স্ত্রীর) সাথে যৌনবাসনায় লিপ্ত হয়েছে, না হয়নি, তার সাথে নির্জনে থেকেছে, না থাকেনি।

বিবাহের সুন্নাত ও আদবসমূহঃ

১। বিবাহের ঘোষণা ও প্রচার করা সুন্নত। অনুরূপ স্বামী-স্ত্রীর জন্য দুআ করাও সুন্নাত। সুতরাং তাদের উভয়ের জন্য এই দুআটি করবে,

((بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ))

"বারাকাল্লাহু লাকা অবারাকা আলায়কা, অজামাআ' বায়নাকুমা ফি খায়রিন" (আল্লাহ তোমাকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় বরকতে ধন্য করুন এবং তোমাদের উভয়কে মঙ্গলের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন!

২। যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে নিম্নের দুআটি পড়া সুন্নাত।

((بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا))

"বিসমিল্লা-হি আল্লাহুম্মা-জান্নিব নাশশায়ত্বানা অজান্নিবিশ্ শায়ত্বানা মা-রাযাক্বতানা" (আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচাও এবং আমাদেরকে যে সম্পদ (সন্তান) দান করবে তাকেও শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচাও।

৩। স্বামী-স্ত্রীর মিলন সম্বন্ধীয় গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করা উভয়ের জন্য হারাম।

৪। ঋতু ও নিফাস অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম। এমন কি পবিত্র হয়ে গেলেও না, যতক্ষণ না সে গোসল করে নিবে।

৫। যৌনসঙ্গমের জন্য নারীর মলদার ব্যবহার করা স্বামীর উপর হারাম। কারণ, এটা ইসলামের হারাম করা মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত।

৬। সহবাসে স্ত্রীকে তৃপ্ত করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। অনুরূপ তার অনুমতি ও প্রয়োজন ব্যতীত গর্ভধারণের আশঙ্কায় আযল (যোনি পথের বহির্দেশে বীর্যপাত) করতে পারবে না।

কোন্ নারীকে বিয়ে করা উচিত?

বিবাহের উদ্দেশ্য হলো, স্বাদ গ্রহণ সহ সুন্দর পরিবার ও সুষ্ঠ সমাজ গঠন। তাই যদি এমন নারীকে নির্বাচন করা হয়, যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় সৌন্দর্যে ও গুণে গুণান্বিতা হবে, তাহলে বহু কল্যাণ লাভে ধন্য হবে। আর বাহ্যিক সৌন্দর্য বলতে জন্মগত পরিপূর্ণতাকে বুঝানো হয়েছে। আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বলতে দ্বীন ও চরিত্র উভয়ের পরিপূর্ণতাকে বুঝানো হয়েছে। আর এটাই (দ্বীন ও চরিত্রের পরিপূর্ণতা) হল আল্লাহর তৌফীকে প্রকৃত পূর্ণতা ও সফলতা। দ্বীনদার নারীকে প্রাধান্য দেওয়াই হলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নাবী কারীম-ﷺ-এ ব্যাপারে অসীয়ত করেছেন। নারীদেরও কর্তব্য হলো, সৎ ও আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তিকে বিবাহ করতে আগ্রহী হওয়া।

যেসব নারীদের বিবাহ করা হারামঃ

যেসব নারীদেরকে বিবাহ করা হারাম, তারা দুই প্রকারের। এক, চিরকালের জন্য যাদের সাথে বিবাহ হারাম। দুই, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যাদের সাথে বিবাহ হারাম।

প্রথমতঃ চিরকালের জন্য যাদের সাথে বিবাহ হারাম তারা তিন প্রকারেরঃ

১। বংশীয় সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ করা হারামঃ আর এরা সাত প্রকারের নারী। এরা কারা, তা মহান আল্লাহ তাঁর (নিম্নের) বাণীতে উল্লেখ করে দিয়েছেন,

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء:٢٣]

“তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে, তোমাদের মাতাগণ, কন্যাগণ, ভগিনীগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ, ভাগিনেয়ীগণ, দুগ্ধ-মাতাগণ, দুগ্ধ-ভগিনীগণ, শ্বাশুড়ীগণ ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে

যার সাথে সহবাস হয়েছে, তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যাগণ, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের (কন্যাদের মাতার) সাথে সহবাস না হয়ে থাকে, তাহলে (তাদের সাথে) তোমাদের (বিবাহে) কোনো দোষ নেই। আর তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে (হারাম করা হয়েছে। হারাম করা হয়েছে,) দুই ভগিনীকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা গত হয়ে গেছে, তা (ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নিসা ২৩)

(ক) মা বলতে, মা, দাদী-নানী সবাইকেই শামিল।

(খ) মেয়ে বলতে, আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও মেয়ের মেয়ে সকলেই মেয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) বোন বলতে, আপন বোন, বৈপিত্রেয়ী বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোন সকলেই বোনের আওতায় পড়ে।

(ঘ) ফুফ বলতে, আপন ফুফু, বাপের ফুফু, দাদার ফুফু, মায়ের ফুফু ও দাদী-নানীর ফুফু সকলেই ফুফুর অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) খালা বলতে, আপন খালা, বাপের খালা, দাদার খালা, মায়ের খালা ও দাদী-নানীর খালা সকলেই খালার আওতায় পড়ে।

(চ) ভাইয়ের মেয়ে বলতে, আপন ভাইয়ের মেয়ে, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে এবং এদের ছেলে ও মেয়েদের মেয়ে এইভাবে যতই নীচে যাওয়া যাবে।

(ছ) বোনের মেয়ে বলতে, আপন বোনের মেয়ে, বৈপিত্রেয়ী ও বৈমাত্রেয়ী বোনের মেয়ে এবং এদের ছেলে ও মেয়েদের মেয়ে ও এইভাবে যতই নীচে যাওয়া যাবে।

২। দুধ সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত মহিলাদের সাথে বিবাহ করা হারামঃ এরা বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম কৃতা নারীদের মতই। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاَعِ ماَ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)) [متفق عليه ١٤٤٧-٢٦٤٥]

"দুধ পানেও ঐরূপ হারাম হয়ে যায়, যেরূপ বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম হয়।" (বুখারী ১৪৪৭, মুসলিম ২৬৪৫) তবে দুধ পানে হারাম হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন,

১। কমপক্ষে পাঁচবার অথবা পাঁচাধিকবার দুধ পান করতে হবে। তাই যদি কোনো শিশু চারবার দুধ পান করে, তাহলে দুধদাত্রী মহিলা শিশুর মা বলে গণ্য হবে না।

২। এই দুধ পান দুধ ছাড়ার (সময়সীমার) পূর্বেই হতে হবে। অর্থাৎ, পাঁচবার দুধ পান করা, দুধ ছাড়া সময়ের পূর্বেই হতে হবে। সুতরাং দুধ পান যদি দুধ ছাড়া সময়ের পরে হয় কিংবা কিছু আগে ও কিছু পরে হয়, তাহলে এই দুগ্ধদাত্রী মহিলা শিশুর মা বলে গণ্য হবে না।

দুধ পানের শর্তাবলী পরিপূর্ণ হলে, শিশু দুধদাত্রী মহিলার ছেলে বলে পরিগণিত হবে এবং মহিলার ছেলে-মেয়েরা তার (দুধ) ভাই-

বোন বলে গণ্য হবে। তাতে তারা পূর্বেকার হোক কিংবা পরে হয়ে থাকুক। মহিলার স্বামীর ছেলে-মেয়েরাও তার ভাই-বোন বলে গণ্য হবে। তাতে তারা ঐ মহিলারই হোক, যে শিশুকে দুধ পান করিয়েছে, কিংবা অন্য মহিলার হোক। এখানে একটি জিনিস জেনে রাখা দরকার যে, দুধ পানকারী শিশুর সন্তানাদি ব্যতীত তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে দুধ পানের কোনো সম্পর্ক নেই। দুধ পান তাদের উপর কোনো প্রভাব সৃষ্টি করবে না।

৩। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যেসব মহিলাদেরকে বিবাহ করা হারামঃ তারা হলো নিম্নরূপ,

১। পিতা ও দাদাদের স্ত্রীগণঃ যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিবাহ করবে, তখনই সেই মহিলা তার ছেলে, ছেলের ছেলে এবং মেয়ের ছেলে ও এইভাবে যত বীচে যাবে, তাদের সকলের উপর হারাম হয়ে যাবে। তাতে সে তার সাথে সহবাস করুক, বা না করুক।

২। ছেলেদের স্ত্রীগণঃ যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে বিবাহ করবে, তখনই সেই নারী তার (ছেলের) পিতা ও দাদা-নানাদের উপর ও এইভাবে যতই উপরে যাবে, তাদের সকলের উপর হারাম হয়ে যাবে। তাতে সে যৌনবাসনায় লিপ্ত হোক, বা না হোক।

৩। স্ত্রীর মা ও দাদী-নানীঃ যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিবাহ করবে, তখনই মহিলার মা ও তার (মহিলার) দাদী-নানী তার

(স্বামীর) উপর হারাম হয়ে যাবে। কেবল বিয়ে সম্পন্ন হলেই হবে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হোক বা না হোক।

৪। স্ত্রীর মেয়েরা এবং স্ত্রীর ছেলেদের ও মেয়েদের মেয়েরা এইভেব যতই নীচে যাবেঃ যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিবাহ করবে এবং তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হবে, তখনই মহিলার মেয়েরা এবং তার ছেলের মেয়েরা ও তার মেয়ের মেয়েরা এইভাব যতই নীচে যাবে সবাই তার উপর হারাম হয়ে যাবে। তাতে এই মেয়েরা মহিলার আগের স্বামীর হোক কিংবা পরের স্বামীর হোক। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই যদি তারা একে অপর থেকে বিছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রীর মেয়েরা স্বামীর উপর হারাম হবে না।

দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যাদের সাথে বিবাহ হারামঃ এরাও কয়েক প্রকারের। যেমন,

১। স্ত্রীর বোন, ফুফু ও খালা ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকবে, যতক্ষণ না মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে স্বামী-স্ত্রী একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তার ইদ্দতও শেষ হয়ে যাবে।

২। অন্যের ইদ্দত পালনকারিণী, অর্থাৎ, যখন কোনো নারী অন্য স্বামীর ইদ্দত পালন করবে, তখন ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে বিবাহ করা বৈধ হবে না। অনুরূপ ইদ্দত পালন করাকালীন তাকে বিয়ের পায়গাম দেওয়াও বৈধ হবে না।

৩। হজ্জ অথবা উমরার নিয়তকারিণী, যে মহিলা হজ্জ অথবা উমরার ইহরাম নিয়ত করবে, তখন হজ্জ ও উমরা থেকে সম্পূর্ণভাবে হালাল না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে বিবাহ করা বৈধ হবে না।

তালাক্বঃ

মূলতঃ তালাক একটি অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু যেহেতু কখনো স্বামীর সাথে স্ত্রীর অবস্থান অথবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর অবস্থান খুবই পীড়াদায়ক হয়ে যাওয়ার কারণে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তালাক্ব দেওয়া অতি প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে, তাই বান্দাদের জন্য তা হালাল করাই ছিলো আল্লাহর রহমতের দাবী। সুতরাং উল্লিখিত (সমস্যার) কোনো কিছু দেখা দিলে, স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক্ব দিতে পারবে। তবে তালাক্ব দেওয়ার সময় তাকে নিম্নে বর্ণিত বিধানের খেয়াল রাখতে হবে।

১। ঋতু অবস্থায় তাকে তালাক্ব দিবে না। যদি ঋতু অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক্ব দেয়, তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যজন এবং হারাম কাজ সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে। আর এমতাবস্থায় তালাক্ব প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তালাক্ব না দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। অতঃপর পবিত্র হয়ে গেলে, সে ইচ্ছা করলে তাকে তালাক্ব দিতে পারবে। তবে উত্তম হলো, দ্বিতীয় হায়েয পর্যন্ত তালাক্ব না দেওয়া। দ্বিতীয় হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে গেলে, ইচ্ছা করলে তাকে তালাক্ব দিতেও পারবে, আবার ইচ্ছা করলে রাখতেও পারে।

২। এমন তহুরে (পবিত্রাবস্থায়) তালাক্ব দিবে না, যে তহুরে সে স্ত্রীর

সাথে সহবাস করেছে, যতক্ষণ না তার গর্ভ প্রকাশ হয়ে যায়। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মাসিকের পর সহবাস করে থাকে, তাহলে পুনরায় মাসিক হয়ে তা থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে তালাক্ব দিতে পারবে না, যদিও এ সময় সুদীর্ঘ হয়। অতঃপর ইচ্ছা করলে তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্ব দিতে পারবে। তবে যদি তার গর্ভ প্রকাশ হয়ে যায় অথবা সে যদি অন্তঃসত্ত্বা থেকে থাকে, তাহলে তালাক্ব দেওয়াতে কোনো দোষ নেই।

তালাক্বের পর যা আরোপিত বিধিসমূহঃ

যেহেতু তালাক্বের অর্থই হলো, স্ত্রীর স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। তাই এই বিচ্ছেদের উপর কিছু বিধান আরোপিত হয়। যেমন, ১। যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে অথবা স্বামী স্ত্রীর সাথে নির্জনে থেকে থাকে, তাহলে ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে। তবে যদি স্বামী যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তার সাথে নির্জনে না থেকে থাকে, তাহলে তাকে কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে না। আর ইদ্দত হলো, তিন ঋতু, যদি ঋতুমতী হয়। আর যদি ঋতুমতী না হয়, তাহলে তিন মাস। আর গর্ভবতী হলে, (তার ইদ্দত হবে) প্রসবকাল পর্যন্ত। আর এই ইদ্দতের উদ্দেশ্য হলো, স্বামীকে তার স্ত্রী প্রত্যাহার করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া। অনুরূপ মহিলা গর্ভবতী কি না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

২। স্ত্রী স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে, যদি সে এই তালাক্বের পূর্বে দুইবার তালাক্ব দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক্ব দেওয়ার পর রুজু' করে থাকে অথবা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিবাহ ক'রে দ্বিতীয় তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যেই আবার রুজু' করে থাকে কিংবা ইদ্দতের পর বিবাহ করে থাকে, তারপর আবার তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে যতক্ষণ না স্ত্রী অন্য কারো সাথে (শরীয়তের) সঠিক পন্থায় বিবাহ করবে এবং তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হবে, ততক্ষণ তার উপর এই স্ত্রী হালাল হবে না। অতঃপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তালাক্ব দিয়ে দেয়, তাহলে সে প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে। নারীদের প্রতি রহম করে এবং স্বামীদের অত্যাচার থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক তিন তালাক্বদাতার উপর তার স্ত্রীকে হারাম করে দিয়েছেন।

খুলআ'

'খুলআ' হল, মালের বিনিময়ে সেই স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর তালাক চাওয়া, যাকে সে পছন্দ করে না। তবে স্বামীই যদি স্ত্রীকে পছন্দ না ক'রে তার থেকে তাকে দূর করতে চায়, তাহলে স্ত্রীর নিকট থেকে কোনো কিছু নেওয়া তার জন্য বৈধ হবে না। বরং তার কর্তব্য হবে, হয় সে ধৈর্য ধরবে, না হয় তালাক দিবে। আর স্ত্রীর উচিত স্বামীর সাথে তার থাকা একান্তই পীড়াদায়ক ও অসহ্যকর না হলে, খুলআ'

না চাওয়া। অনুরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকে খুলআ' চাওয়াতে বাধ্য করার জন্য কষ্ট দেওয়া স্বামীর জন্য বৈধ নয়। আর মোহরের অধিক স্ত্রীর কাছ থেকে নেওয়া অপছন্দনীয়।

বিবাহে একে অপরের অধিকারঃ

কোনো কারণবশতঃ বিবাহ বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার অথবা তা বানচাল করার অধিকার স্বামী-স্ত্রীর রয়েছে। যেমন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অথবা স্ত্রী স্বামীর মধ্যে এমন রোগ বা জন্মগত দোষ পেল, যা উভয়কে আক্বদের সময় জ্ঞাত করানো হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের এ বিবাহ বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও না রাখার অধিকার রয়েছে। যেমন মনে করুন,

১। তাদের উভয়ের মধ্যে কেউ পাগল অথবা এমন রোগাক্রান্ত যে, এটা অপরকে বিবাহের সম্পূর্ণ অধিকার পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করে, এমতাবস্থায় অপরজনের এ বিবাহকে বানচাল করার অধিকার থাকে। আর যদি এটা সঙ্গমের পূর্বে হয়, তাহলে স্বামী স্ত্রীকে দেওয়া মোহর ফিরত নিবে।

২। যদি সাথে সাথে মোহর দিতে অক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রী যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহকে বানচাল করতে পারে। কিন্তু সহবাসের পর হলে, তা পারবে না।

৩। ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হওয়া। যদি স্বামী ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয়,

তাহলে স্ত্রী সাধ্যানুসারে কিছু দিন অপেক্ষা করার পর কাজীর মাধ্যমে এ বিবাহ বানচাল করতে পারবে।

৪। যদি স্বামী অদৃশ্য হয়ে যায়, সে কোথায় আছে, তা যদি কাউকে না জানায়, স্ত্রীর খরচের জন্য যদি কিছু রেখে না যায় বা কাউকে এ ব্যাপারে অসিয়ত না করে যায়, কেউ যদি তার ব্যয়ভার গ্রহণ না করে এবং তার নিকট ব্যয় করার মত কিছু যদি না থাকে, তাহলে সে শরীয়তের কাজীর মাধ্যমে এ বিবাহ বানচাল করতে পারবে।

অমুসলিম নারীকে বিবাহ করাঃ

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ব্যতীত অন্য কোনো অমুসলিম নারীকে বিবাহ করা মুসলিমদের জন্য হারাম। আর কোনো অমুসলিমকে বিবাহ করা মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয়। তাতে সে ইয়াহুদী হোক অথবা খ্রীষ্টান যদি কোনো নারী স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে যতক্ষণ না স্বামী ইসলাম গ্রহণ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য জায়েয হবে না যে, সে নিজেকে স্বামীর জন্য পেশ করবে। নিম্নে অমুসলিমদের সাথে বিবাহ করার কতিপয় বিধান পেশ করা হচ্ছেঃ

১। যদি অমুসলিম স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তারা তাদের বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যদি কোনো শরীয়তী বাধা-নিষেধ না থাকে। বাধা-নিষেধ বলতে যেমন, নারী যদি স্বামীর

জন্য হারাম হয় অথবা তাকে বিবাহ করা স্বামীর জন্য হালাল না হয়, তাহলে তাদের উভয়কে একে অপর থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে।

২। কোনো ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান নারীর স্বামী যদি ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তারা তাদের বিবাহে প্রতিষ্ঠিত থাকবে (নতুন করে বিবাহ করার প্রয়োজন হবে না)।

৩। ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর কেউ যদি সঙ্গমের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে নিকাহ বাতিল হয়ে যাবে।

৪। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান বা অন্য কোনো অমুসলিম স্বামীর স্ত্রী সহবাসের পূর্বে যদি ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে, কেননা, কোনো মুসলিম নারী কাফেরের জন্য বৈধ নয়।

৫। কোনো কাফেরের স্ত্রী সঙ্গমের পর যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটি স্থগিত থাকবে। অতঃপর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে এবং স্বামী ইসলাম কবুল না করলে, তা (বিবাহ) বাতিল হয়ে যাবে। এরপর স্ত্রী (সঙ্গে সঙ্গেই) যাকে ইচ্ছা বিবাহ করে নিতে পারে, আবার স্বামীর জন্য অপেক্ষাও করতে পারে। আর এই (অপেক্ষা করার) সময়ে স্ত্রীর স্বামীর উপর কোনো অধিকার (পাওনা) থাকবে না। অনুরূপ স্ত্রীর উপর স্বামীরও কোনো আধিপত্য থাকবে না। পরে যদি স্বামী ইসলাম কবুল করে নেয়, তাহলে সে তার স্ত্রীই থাকবে নতুনভাবে বিবাহ করার প্রয়োজন হবে না, যদিও তার (স্বামীর) জন্য সে কয়েক বছর অপেক্ষা করে। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান

ব্যতীত অন্য কোনো অমুসলিম নারীর স্বামী ইসলাম কবুল করলে, তার বিধানও অনুরূপ।

৬। যদি যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই স্ত্রী মুর্তাদ (ধর্মবিমুখ) হয়ে যায়, তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং সে মোহরও পাবে না। তবে যদি স্বামীই মুর্তাদ হয়ে যায়, তাহলে বিবাহ বানচাল হয়ে যাবে, আর স্বামীকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। তাদের মধ্যে যে মুর্তাদ হয়েছিল, সে যদি পুনরায় ইসলাম স্বীকার করে নেয়, তাহলে তারা প্রথম বিবাহের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যদি তাদের মধ্যে তালাক্ব সংঘটিত না হয়ে থাকে।

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিবাহ করার (অবাঞ্ছনীয়) প্রভাবঃ

আল্লাহর বিবাহ ব্যবস্থাকে বৈধ করার মধ্যে উদ্দেশ্য হল, চরিত্রের শুদ্ধিকরণ, সমাজকে অশ্লীলতা থেকে পবিত্রকরণ, লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ এবং সমাজের জন্য একটি সুষ্ঠু ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সংস্থাপন সহ এমন মুসলিম উম্মার গঠন, যার মুখ থেকে উচ্চারিত হবে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাই কোনো নেক, ধার্মিকা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না ও চরিত্রবান মহিলাকে বিবাহ না করলে উক্ত উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর মুসলিম যদি কোনো ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান মেয়েকে বিয়ে করে তার কুপ্রভাব কি পড়তে পারে, তার কিছু কথা তুলে নীচে ধরা হচ্ছে,

১। পরিবারে তার (অবাঞ্ছনীয়) প্রভাবঃ ছোট পরিবারে স্বামী ব্যক্তিগতভাবে

শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হলে তার প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও বড় আশা থাকে যে, সে ইসলাম কবুলে ধন্য হবে। আবার এর বিপরীতও হতে পারে। কারণ, স্ত্রী অন্য ধর্মকে আকঁড়ে ধরে থাকবে এবং ঐ সমস্ত জিনিস সে পালন করবে, যে ব্যাপারে সে মনে করে যে, তার ধর্ম এগুলোকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। যেমন, শারাব পান ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করা এবং গোপনে প্রেম করা ইত্যাদি। আর এইভাবে একটি মুসলিম পরিবার ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়বে। সে পরিবারের সন্তানেরা নৈতিক শৈথ্যিলের উপর গড়ে উঠবে। আবার কখনো সমস্যা আরো জঘন্য পরিস্থিতির শিকার হতে পারে, যখন এই অন্ধভক্তা বা হঠকারিণী স্ত্রী তার সন্তানদেরকে সাথে করে গীর্জায় নিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টানদের নামায দেখাবে এবং তাদের মধ্যে এর প্রতি বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করবে। কথায় বলে, মানুষ জিনিসের উপর লালিত-পালিত হয়, সে সেই জিনিসের স্বভাবে স্বভাবসিদ্ধ হয়।
২। সমাজে তার (অবাঞ্ছনীয়) প্রভাবঃ মুসলিম সমাজে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদের আধিক্য খুবই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ, এই নারীরা মুসলিম উম্মার চিন্তাধারার উপর বিপজ্জনক আক্রমণ চালাতে ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে এবং খ্রীষ্টীয় কার্যকলাপ ও জঘন্য স্বভাব প্রচারের জন্য দূতের কাজ করবে। তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলো, নারী-পুরুষের নগ্নতার সাথে অবাধ মিলামিশার অভ্যাস সহ অন্য আরো ইসলামী শিক্ষা বিরোধী প্রচেষ্টা।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	যাকাতের হুকুমঃ
৩	কিসে যাকাত ওয়াজিব হয়
৪	সোনা ও রূপার যাকাতঃ
৫	ব্যবসা-সামগ্রীতে যাকাত
৭	জমি থেকে উৎপন্ন ফসলে যাকাত
৮	চতুষ্পদ জানোয়ারের যাকাত
১২	যাকাতের হকদার
১৬	খাদ্য সম্পর্কীয় বিধি-বিধান
২০	জবাই করার বিধান ও শর্তাবলী
২১	জবাই করার আদবসমূহ
২২	শিকার
২৪	পোশাক-পরিচ্ছদের বিধিসমূহ
২৮	পোশাক-পরিচ্ছদের সুন্নাত ও আদবসমূহ
২৮	নতুন পোশাক পরার সময় দুআ
৩২	বিবাহের শর্তাবলী
৩৪	বিবাহের পর যা আরোপিত হয়
৩৬	বিবাহের সুন্নাত ও আদবসমূহ
৩৮	যেসব নারীদের বিবাহ করা হারাম
৪৩	তালাক্বের বিধান
৪৬	বিবাহে একে অপরের অধিকার